সাহিত্যানুশীলন

উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন

বাংলা ক । দ্বাদশ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে একাদশ শ্রেণির
ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।
বিক্রয়যোগ্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

সেমিস্টার-III

আদরিণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়র উকিল কুঞ্জবিহারীবাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মুখুজ্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ি থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে, কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন— "কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এস্টেটের বাঁধা মোক্তার?— আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে, বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই জানিয়াছে। উকিলবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুজ্যে মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলছি? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়— আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জে যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন—"ভায়ারা, বোস।"—বলিয়া সমুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।— উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারি কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"যাবার তো খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া তো সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ির পথ নেই। গোরুর গাড়ি করে যেতে হলে, যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পালকি করে যাওয়া— সেও জোগাড় হওয়া মুশকিল। আমরা দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুজ্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ি থেকে একটা হাতি-টাতি আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দুজনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতিতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—''এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র তো আমার আজকের মক্কেল নন—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়িতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতি এসে যাবে এখন।''

কুঞ্জবাবু বলিলেন—''দেখলে হে ডাক্তার, আমি তো বলেইছিলাম—অত ভাবছ কেন, মুখুজ্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুজ্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।''

''যাব বইকি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত ভাই খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগ্‌গ বেঁধে, একটি থেলো হুঁকো হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব—তদারক করে বেড়াব। আর তোমরা বসে শুনবে— 'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন?'' —বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুজ্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা সমাপন করিয়া জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতির কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, ''প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেষু'' পাঠ লিখিয়া, দুই তিনদিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদের— রঙটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁপগুলি মোটা মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইঁহার আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে আসেন, তখন এদিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক গোরুর গাড়িতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটি ছিল। সহায় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইয়া মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানির কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ জেলায় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে বটে— কিন্তু জয়রাম মুখুজ্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। তখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ? যৌবনকালে ইনি রীতিমতো বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সেকালে, হাকিমেরা একটু অবিচার অত্যাচার করিলেই মুখুজ্যে মহাশয় রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটির সহিত ইঁহার বিলক্ষণ বচসা হইয়া যায়। বিকালে বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। তখন আদর করিয়া উক্ত ডেপুটিবাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করিলেন। ডেপুটিবাবু লোক পরম্পরায় ক্রমে একথা শুনিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য, নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই। আর একবার, এক ডেপুটির সম্মুখে মুখুজ্যে মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইঁহার কথায় সায় দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন—''আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি।'' সেদিন আদালত-অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচটাকা জরিমানা হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্বসুদ্ধ ১৭০০ টাকা ব্যয় করিয়া এই পাঁচটা টাকা জরিমানা হুকুম রহিত করিয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন, তেমনি তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, গরীব লোকের মোকর্দমা তিনি কত সময় বিনা ফিসে, এমন কি নিজে অর্থব্যয় পর্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্নকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাস পাশা খেলিয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছেন—পূর্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবুও আছেন। হাতিকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিস্কৃত করা হইতেছে, হাতি রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাসুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে,—মোক্তার মহাশয় সে সমস্ত তদারক করিতেছেন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দুই চারি টান দিয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জয়রাম, বৈঠকখানায় বসিয়া পাশাখেলা দেখিতেছিলেন। এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল— ''হাতি পাওয়া গেল না।''

কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—''অ্যা!—পাওয়া গেল না?''

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—''তাই তো! সব মাটি?''

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—''কেন রে, হাতি পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস?''

ভৃত্য বলিল— ''আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন, বিয়ের নেমতন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতি কেন? গোরুর গাড়িতে আসতে বোলো।''

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে, ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—''হাতি দিলে না! হাতি দিলে না!''

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—''তার আর কি করবেন মুখুজ্যে মশায়! পরের জিনিস, জোর তো নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে রাত্রি দশটা এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌঁছে যাবেন। ঐ ইমামদ্দি শেখ একজোড়া নূতন বলদ কিনে এনেছে—খুব দ্রুত যায়।''

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন—''না। গোরুর গাড়িতে চড়ে আমি যাব না। যদি হাতি চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিনজন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল—''বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী-হাতি আছে—এখনও বাচ্চা। বিক্রি করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।''

''কত?''

''দুই হাজার টাকা।''

''খুব বাচ্চা?''

''না, সওয়ারি নিতে পারবে।''

''কুছ পরওয়া নেই। তাই কিনব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতি আসে। লাহিড়ি মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতির সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতি দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।''

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়িতে হাতি আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই একজন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—''হাতি, তোর গোদা পায়ে নাতি।'' বাড়ির বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুজ্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয় পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই

জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রাঙা করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে, রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।—

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে হস্তী প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরেরও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকর্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—''মুখুজ্যেমশায়, ও হাতিটি কার?''

মুখুজ্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—''আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতি।''

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—''আমার হাতি। কই ও-হাতি তো কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?''

''আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।''

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—''আপনি কিনেছেন?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

''তবে বললেন আমার হাতি?''

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—''যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি—আমিই যখন আপনার—তখন ও-হাতি আপনার বই আর কার?'' সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েকদিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে—এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্বে যত উপার্জন করিতেন এখন তাহার অর্ধেক হয় কিনা সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতি বৎসর বর্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কর্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয় এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় পাগড়ি বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না।) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া ফর ফর করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরাজি জানা জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করেন,—''উনি কি বলছেন?''—জুনিয়র তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্বে হাকিমগণ মুখুজ্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইঁহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজি জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে স্থির করিয়াছেন, কর্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়স হইল—চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়িতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশি দিন চলে না। তথাপি আজি কালি করিয়া আরও এক বৎসর কাটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। একজন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন-তাঁহারই এজলাসে বিচার।— তিনদিন যাবৎ মোকর্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া 'জজসাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ' বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতাশেষে এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—জজসাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজসাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছেন, এমন সময় জজসাহেব পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—''এ উকিলটির নাম কি।''

পেশকার বলিল—''উঁহার নাম জয়রাম মুখার্জি। উনি উকিল নহেন, মোক্তার।''

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—''আপনি মোক্তার?''

জয়রাম বলিলেন—''হ্যাঁ হুজুর, আমি আপনার তাঁবেদার।''

জজসাহেব পূর্ববৎ বলিলেন—''আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি উকিল। যে রূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দমা চালাইয়াছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম আপনি এখানকার একজন ভাল উকিল।''

এই কথাগুলি শুনিয়া মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। হাত দুটি জোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"না হুজুর; আমি উকিল নহি—আমি একজন মোক্তার মাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের একজন মূর্খ মোক্তার। ইংরাজি জানি না হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন আমি জীবনের শেষ দিন অবধি তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন্।"

বলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারি যান নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া ওঠে না। সুদের সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানির কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল—"হাতিটি আর কেন, ওকে বিক্রি করে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিনাতিনীদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রি করে ফেল।" —এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতিটাকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন: —

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১ টাকা এবং মাহুতের খোরাকী।।০ একুনে ৪।।০ ধার্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, শহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে—কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশি আয় হইল না।— মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫। ৭ টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।— বড়বধূ মেজবধূ উভয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদাপর্ণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানাস্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু ঘর-বর মনের মতন হয় না। যদি ঘর-বর মনের মতন হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এসম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া, তাশ পাশা খেলিয়া, ফুলুট বাজাইয়া বেড়াইতেছে। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে।— অবশেষে একস্থানে বিবাহের স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল.এ. পড়িতেছে, খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে; নিজেদের খরচ পাঁচ শত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানির কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে— তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু তো একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে? —এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠপুত্রটি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল, সে-ও ফেল করিয়াছে।— বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন— ''মুখুজ্যে মহাশয়, হাতিটিকে বিক্রি করে ফেলুন—করে নাতনির বিবাহ দিন। কি করবেন বলুন। অবস্থা বুঝে তো কাজ করতে হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।''

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটির পানে চাহিয়া ম্লানমুখে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর ঘোড়া হাতি উট বিক্রয়ার্থে আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—''হাতিটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রি হয়ে যাবে এখন। দু'হাজার কিনেছিলেন, এখন হাতি বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।''

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—''কি করে তোমরা এমন কথা বলছ?''

বন্ধুরা বুঝাইলেন—''আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মতো। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি চলে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রি করলেই হয়। যে বেশ আদর যত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না— এমন লোককে বিক্রি করবেন।''

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—''তোমরা সবাই যখন বলছ তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভালো খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।''—মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি-পাঁচ দিনই জমজমাট বেশি। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে হস্তী ভোজন করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলী খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়ালেন। শেষে তাহার গলায় নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—''আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এসো।''—প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে, এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয়পক্ষের আশীর্বাদ হইবে। হস্তী-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হইবে।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়িতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল।

বাড়ির লোকে বলিতে লাগিল—''আহা, আদর রোগা হয়েছে। বোধ হয় এ ক'দিন সেখানে ভাল করে খেতে পায়নি। ওকে দিনকতক এখন বেশ করে খাওয়াতে হবে।''

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভালো হাতির খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—''ঐ যে আবার মুখুজ্যে মশায় বললেন 'আদর যাও মা, মেলা দেখে এসো'

তাই বিক্রি হল না। উনি তো আর আজকালকার মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন! ওঁর মুখ দিয়ে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে— ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল—"দাদামহাশয় আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বললি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জানতে পেরেছে। ওরা অন্তর্যামী কিনা। ও বাড়িতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি? —খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোন অভিমান করিসনে মা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্রপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে—"বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আম বাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায় তবে তাহার

শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।”

বাড়ির মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—‘‘আমার গাড়ির বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরি করতে পারব না।” তখনই ঘোড়ার গাড়ির বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধুরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ি ছাড়িল। জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ।—বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—‘‘অভিমান করে চলে গেলি মা? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে—তুই অভিমান করে চলে গেলি?”

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ - ৫ই এপ্রিল, ১৯৩২) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথা সাহিত্যিক, ছোটগল্পকার ও উপন্যাসিক। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্ধমান জেলার, ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, পাটনা কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়তে বিলেত যান এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ‘ভারতী’ পত্রিকায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। শ্রীমতী ‘রাধামনি দেবী’ ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। রমাসুন্দরী, ‘নবীন সন্ন্যাসী’, ‘রত্নদ্বীপ’, ‘জীবনের মূল্য’, ‘প্রতিমা’ প্রভৃতি উপন্যাস এর পাশাপাশি ‘নবকথা’, ‘ষোড়শী’, ‘গল্পাঞ্জলি’, ‘গল্পবীথি’ প্রভৃতি গল্পসংকলনগুলি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। সরল ও অনাবিল হাস্যরসের গল্পলেখক হিসাবে প্রভাতকুমার সমধিক প্রসিদ্ধ। বিচিত্রমুখি গল্পের জন্য তিনি বাংলার মোপাসাঁ নামে খ্যাত। ‘আদরিণী’ গল্পটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘গল্প সমগ্র’ দ্বিতীয় খণ্ড থেকে নেওয়া।

ধর্ম

শ্রীজাত

আবদুল করিম খাঁ-র ধর্ম ছিল গান।
আইনস্টাইনের ধর্ম দিগন্ত পেরনো।
কবীরের ধর্ম ছিল সত্যের বয়ান।
বাতাসের ধর্ম শুধু না-থামা কখনও।

ভ্যান গঘের ধর্ম ছিল উন্মাদনা। আঁকা।
গার্সিয়া লোরকা-র ধর্ম কবিতার জিত।
লেনিনের ধর্ম ছিল নতুন পতাকা।
আগুনের ধর্ম আজও ভস্মের চরিত।

এত এত ধর্ম কিন্তু একই গ্রহে থাকে।
এ-ওকে, সে-তাকে আরও জায়গা করে দেয়।
তবে কেন অন্য পথ ভাবায় তোমাকে?
তোমার ধর্মের পথে কেন অপব্যয়?

যে তোমাকে শিখিয়েছে দখলের কথা—
জেনো সে ধর্মই নয়। প্রাতিষ্ঠানিকতা।

শ্রীজাত : ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি শ্রীজাত নামেই অধিক পরিচিত, বর্তমান সময়ের এক অসামান্য কবি ও গীতিকার। তিনি ২০০৪ সালে তার 'উড়ন্ত সব জোকার' কবিতার বই-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার পান। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'শেষ চিঠি' (১৯৯৯), 'দু-চার কথা' (২০০০), 'অনুভব করেছি তাই বলছি' (২০০১), 'বর্ষামঙ্গল' (২০০৬), 'কিছু কবিতা' (২০১১), 'কর্কটক্রান্তির দেশ' (২০১৪), 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ' (২০১৫), 'লিমেরিক' (২০১৮) ইত্যাদি। তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের জন্য বহু গান রচনা করেছেন। এটি 'অন্ধকার লেখাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের ১৪ সংখ্যক কবিতা।

দিগ্বিজয়ের রূপকথা

নবনীতা দেবসেন

রক্তে আমি রাজপুত্র। হলেনই বা দুঃখিনী জননী,
দিগ্বিজয়ে যেতে হবে। দুয়োরানী দিলেন সাজিয়ে।
কবচকুণ্ডল নেই, ধনুক, তূণীর, শিরস্ত্রাণ
কিছুই ছিল না। শুধু আশীর্বাদী দুটি সরঞ্জাম।

এক : এই জাদু-অশ্ব। মরুপথে সেই হয় উট,
আকাশে পুষ্পক আর সপ্তডিঙ্গা সাজে সিন্ধুজলে,
তেপান্তরে পক্ষীরাজ। তার নাম রেখেছি : 'বিশ্বাস।'
দুই : এই হৃদয়ের খাপে ভরা মন্ত্রপূতঃ অসি
শাণিত ইস্পাত খণ্ড। অভঙ্গুর। নাম : 'ভালোবাসা।'

নিশ্চিত পৌঁছুবো সেই তৃষ্ণাহর খর্জুরের দ্বীপে।।

নবনীতা দেবসেন : (১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ - ৭ই নভেম্বর, ২০১৯) ছিলেন বিখ্যাত কবি, লেখক এবং শিক্ষাবিদ। তিনি দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে বাবা-মা'র 'ভালোবাসা' গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্র দেব ও মাতা রাধারাণী দেবী — সে যুগের বিশিষ্ট কবি দম্পতি। তিনি গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস, লেডি ব্রেবোর্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর, হার্ভাড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯-এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম প্রত্যয়' প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এ প্রথম উপন্যাস 'আমি অনুপম' প্রকাশ পায়। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি উপন্যাস মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটত্রিশ। ২০০০ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে তিনি ভূষিত হন। এই কবিতাটি 'নবনীতা দেবসেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া।

বাঙগালা ভাষা

স্বামী বিবেকানন্দ

[১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকা-হইতে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামীজী যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত]

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যারা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা— সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক-চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,— লক্ষণ।

যদি বল-ও কথা বেশ; তবে বাঙগালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না— কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙগালা দেশের ভাষা হ'য়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ,

সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরেমতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ— আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধুম— দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে,— 'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে— তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল— ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন— সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ : (১২ই জানুয়ারি ১৮৬৩ - ৪ঠা জুলাই ১৯০২) কলকাতার শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত - বিখ্যাত আটর্নি, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবে তাঁর ডাক নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি.এ. পাশ করেন। পিতার অকাল মৃত্যুর পর সাংসারিক দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। তিনি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীতে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি মানবসেবায় দীক্ষা নেন। ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি পরিব্রাজক রূপে সারাভারত ভ্রমণ করেন। তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ সভায় হিন্দু ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে ভারতকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল — 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি। তিনি উদ্বোধন, মাসিক বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন' (১৮৯৭) এবং 'বেলুড় মঠ' (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠা করেন।

পোটরাজ

শঙ্কররাও খারাট

গ্রামের পোটরাজ দামার বাড়ির আবহাওয়া ভারী। সমস্ত জায়গায় কেবল লোকেরা হাঁটুর উপর মাথা রেখে ব'সে। দামার বৌয়ের চোখ জল ভরা। থেকে-থেকেই সে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা আসছে, একটুক্ষণ থেকেই চ'লে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝেই কেউ-না কেউ এসে দোরে দাঁড়াচ্ছে।

লোকে এসে শুধোচ্ছে, 'দুরপত, পোটরাজ কেমন আছে?'

'এখনও প্রাণটুকু আছে খালি, বাবা।' করুণ মুখে জবাব দিচ্ছে সে।

'ভেবো না, ভালো হ'য়ে যাবে, ভালো হ'য়ে যাবে। কাঁদছো কেন? সারা গাঁয়ে একই অবস্থা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একজন অন্তত বিছানায়।'

'জানি, বাবা। তাও ভয় লাগে।'

'দুরপত, কারু যাওয়ার সময় হ'লেই সে যাবে। আর যার সময় হয়নি, যা-ই রোগ হোক-না কেন, সে টিকে যাবে।'

'জানি বাবা। ঠিক। কিন্তু বড়ো কঠিন রোগ।'

'কেউ না বলেছে? এখন ঠাকুরের মুখে চাওয়ার সময়। হয়তো এবার মা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবেন। তাঁর কাছে সক্কলে সমান।'

ঠিক এইসময়ে বাড়ির সামনের নিমগাছে একটা কাক চেঁচিয়ে ওঠে। দুরপত বলে, 'এই বাচ্চারা! মার বেজন্মাকে। পোটরাজকে ডাকে রে।'

কাকটা ডেকেই চলে। দুরপতের ছেলে তার দিকে ঢিল ছোড়ে। ডাকতে-ডাকতেই কাকটা উড়ে পালায়।

'সবসময় বেজন্মাটা আমাদের শাপমণ্যি করছে।' দুরপত গজগজ করে আপনমনে।

এ হ'লো আষাঢ় মাস। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সমানে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। মাটি কাদায় আঠাল হ'য়ে এলো। গুমোট। গাছের পাতা একটুও নড়ছে না, স্থির। তা থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে।

দামার বাড়ির দরজায় একটা কুকুর টানা চীৎকার জুড়ে দিলে। শুনে দুরপতের প্রাণ শুকোয়। সেই আওয়াজের উপর দিয়ে সে চ্যাঁচায়, 'হে ভগবান, গোর দেয় না কেন কেউ কুত্তাটাকে।'

'ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতের কথা বলছে গো।' দুরপতের পাশে বসা বৌটি বলে। তখন দুরপতের অন্য পাশে বসা বঞ্চলা বলে, 'দুরপা, মারী-আই-এর যাত্রায় গিয়েছিলি তো?'

'যেতে ভুলি কী ক'রে?'

'তা বলিনি। ভাবলাম এই বিপদের সময়ে যদি ভুলে গিয়ে থাকিস?'

'না, মেয়ে, মা যদি নিদয়াও হন তাঁকে তো কিছু দিতেই হবে।'

'ছাড়্ তো। হঠাৎ কথাটা মাথায় এলো ব'লে বললাম।'

'সব দেবতার মধ্যে ওঁরে তুচ্ছি করি সাধ্যি কী। ওঁরে কেউ হেলা করেছে কি টেরটি পেয়েছে। ক্রোধ তেনার বন্ননার বাইরে। ওঁরে তুষ্ট রেখে ভালো করেছিস। এবার সে ভালো হ'য়ে যাবে।'

মেয়েটি দুরপতের মুখে তাকিয়ে যোগ করে, 'এই দ্যাখো, কাঁদিস কেন? কাঁদলে অমঙ্গল হয়। দুরপা, তোর সোয়ামির কিছু হবে না রে। মা ওকে দেখবেন।'

'সে তো বটেই। ওর বাপ-মা মায়ের কাছে মানত করেছিলো ওকে। সে-জন্যেই তো ও পোটরাজ।'

বঞ্চলাবাঈ বলে, 'তা'হলে? এই তো বুঝেছো। দামা হ'লো গিয়ে মায়ের পোটরাজ। তাঁর ভক্ত। নিত্যি তাঁর পুজো করে। মা কি তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন না? তাঁর রোষে সে পড়ে কী ক'রে? ব্যাপারটা কী? উনি কি দেখতে পান না এ-ঘরে ছোটো ছেলেপিলেরা রয়েছে?' দুরপা বলতে শুরু করে, 'এ-সব কথাই মনে জেগেছে গো। হে মা, তোমার রোষে পড়লাম কেন? এ-বাড়িতে ঢোকা ইস্তক মঙ্গলবারে শুক্কুরবারে তোমার নামে উপুশ করেছি। হে মা, বছর-বছর তোমার যাত্রা করি। তোমায় দুধে, দই-এ চান করাই। সবুজ শাড়ি পরাই। কপালে হলুদ, কুমকুম দিই। তোমার সুমুখে ভোগ দিই, নারকেল দিই। প্রতি আষাঢ়ে অমাবস্যায় তোমার সামনে স্নানের পর ভেজা শাড়িতে গড়ান দিই। বছর-বছর যেমন পারি তোমায় দিই। ছাগল দিতে না-পারলে কুঁকড়ো দিই। তোমার দোরে রক্তের ছড়া দিই।

'মা, এ-বাড়িতে যেদিন থেকে বৌ হ'য়ে এসেছি তোমার সামনে পিদিম দিয়েছি। কখনো তোমায় আঁধারে রেখেছি, বলো মা? তোমারে এত ভক্তি করি তবু আমার কপালে এমন কেন মা?'

'মা, তোমার লিলে বুঝি না।'

দুরপত ব'লেই চলে, ব'লেই চলে। তার গলায় আর্তি। শেষে মারী-আই-এর মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে হাত জোড় ক'রে সে প্রার্থনা করে।

'দেবী, আমি কি কোনো ভুল করেছি? কী ভুল করেছি? ভুল ক'রে থাকলে শাস্তি দাও। কিন্তু আমার সোয়ামিকে বাঁচাও। তার হাগা বমি বন্ধ ক'রে তাকে ভালো করো মা।'

আবহাওয়া থমথমে। গাঁয়ের সর্বত্র কান্না আর চীৎকারের আওয়াজ। আর দুরপতের বাড়ির বাইরের নিমগাছে ব'সে একটা কাক ডাকছে।

শুনে তার হাত-পা স্থির।

রাতে একটা ফেউ বাড়ির চাদ্দিকে চক্কর দিতে-দিতে তীক্ষ্ণ চীৎকারে অন্ধকারকে চেরে। আর দুরপতের বুকের ধুকধুকি পলকের জন্য থমকায়।

তারপর নতুন দিন হয়।

আকাশে মেঘ ঘন ক'রে আসে। চাদ্দিক অন্ধকার, খাঁ-খাঁ লাগে। সমানে বিষ্টি পড়ছে। সূর্য উঁচু হ'য়ে যায়, কিন্তু মেঘের জন্য চোখে পড়ে না। এমন সময় গাঁয়ের মোড়ল আর তার চেলা দুয়ারে আসে। চেঁচিয়ে বলে, 'দামা, বাড়ি আছো নাকি, দামা?'

পোটরাজের বাড়ির ভিতর থেকে কোনো জবার আসে না। এমনকি ফিশ-ফিশানিও না। তাতে মোড়ল গলা চড়ায়, 'ওহে দামা, পোটরাজ বাড়ি আছে?' শেষ পর্যন্ত কেউ-একজন উকি মারে এবং লোক চারজনকে দেখে বলে, 'গ্রামমণ্ডলের লোকেরা এয়েছে গো।'

বঞ্চলাবাঈ বলে, 'সে তো সত্যি। পোটরাজ কেমন আছে দেখতে লোকে তো আসবেই। তিনদিন হ'য়ে গেলো পোটরাজ রোঁদে বেরোয় না।'

'তাছাড়া প্রায় সব বাড়িতেই একজন ক'রে বিছানায়।'

'কে যে কাকে বলে।'

'কে কী বলবে। কেই জানে না আজ তার কপালে কী ঘটবে।'

'তা ঠিক। তাও সবাই অন্যকে জিগেশ করে।'

'ভুলো না, দামা গাঁয়ের পোটরাজ। আর এখন যখন মা খেল শুরু করেছেন যে-ই তাঁর সামনে পড়বে সে-ই তাঁর কোপে পড়বে। তাই এই দোরে লোককে আসতে হবেই।' মেয়েরা যখন কথা বলছিলো দুরপত দরজার কাছে গেলো। বাইরে আসতে-আসতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো দুরপত। মোড়ল-এর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'পেন্নাম হই।'

তার অবস্থা দেখে মোড়ল শুধোলে, 'দামা কোথায় এ-কদিন?'

'ঘরে বিছানায়।'

'বিছানায়? কেন?

'মায়ের দয়া।' বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফ্যালে। মুখ ঢাকে সে।

'বলো কী, মা নিজের ভক্তকেই হেনেছেন?' মোড়ল অবাক হয়।

আরেকজন বলে, 'নয় কেন? মানুষ তো সে।'

'তা ঠিক, কিন্তু তার সকাল-সাঁঝ মায়ের ছায়ায় বসবাস।'

'কিন্তু দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে যে কোপে পড়বে আর কে পড়বে না তার ঠিক নেই।'

‘তা ঠিক,’ মোড়ল বলে। তারপর দুরপতের দিকে ঘুরে তাকায়, ‘দুরপত, আমাদের আরেকবার যাত্রা করতেই হবে।’

‘হ্যাঁ। করতেই হবে। মাকে খুশি করতেই হবে।’ কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে বলে দুরপত।

‘কিন্তু আমাদের সেবাইৎকে না-হ’লে যাত্রা করা যাবে কী ক’রে?’

‘ঠিক, কিন্তু মরদটা আমার প’ড়ে আছে যে।’

‘দুরপত, মাকে গাঁয়ের সীমানায় নিয়ে যেতে হবেই।’

‘ঠিক। না-হ’লে মার চক্কর গাঁয়ের উপর থেকে কাটবে না।’ আরেকজন যোগ করে। ‘তাই দেবীকে মিছিল ক’রে গাঁয়ের সীমানার বাইরে রেখে আসতে হবে তো।’

‘জানি, কিন্তু পোটরাজ যে বিছানায় প’ড়ে আছে। কী ক’রে করবে?’

মোড়ল এই কথা বলতে দুরপত বললে, ‘যদি শুধু পোটরাজ বিছানায় প’ড়ে থাকে সারা গাঁ ‘‘যাত্রা’’য় যাবে না কেন?’

‘তা কী ক’রে হয়? সে হ’লো দেবীর পোটরাজ। তাকে ছাড়া ‘‘যাত্রা’’ হবে কী ক’রে?’

‘তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সে তো উঠতেই পারছে না। নড়তেই পারছে না।’

দুরপত এই কথা বলতে গাঁওবুড়োরা নিজেদের মধ্যে শলায় লাগলো। হঠাৎ মোড়লের মাথায় একটা কথা খেললো, ‘আরে! তোর বড়ো ছেলে তো বাড়িতেই আছে, আছে না?’

‘ওই হাইস্কুলে পড়ছে এখন যে-ছেলেটা? হ্যাঁ, আছে।’

‘ওর কথাই বলছি।’

‘হ্যাঁ, বাড়িতেই ব’সে আছে।’

‘তা ওর বাবার জায়গায় ও যদি ‘‘যাত্রা’’টা করে তো ক্ষতি কী!’

‘অতটুকু বাচ্চা পারবে কী? ওকে কি এখনই পোটরাজ বলা যায়?’

‘পোটরাজ যদি নাও হয় এখন ওকেই পোটরাজ ব’লে ধরতে হবে। ওর বাবা না-থাকলে তোর বাড়িতে তো একজন পোটরাজ থাকতে হবেই।’

‘তা তো হবেই। কিন্তু শুধু বাক্যিতে কি পোটরাজ হয়। তার জন্য দরকার ‘‘যাত্রা’’ করা। তাছাড়া দেবীর কাছে কিছু-একটা মানত করাও দরকার।’

‘করুক-না ও, কী এসে-যায়! তাছাড়া গাঁয়ের জন্যে একজন পোটরাজ তো দরকারই।’

দুরপতের বড়ো ছেলে আনন্দ সব কথাই শুনতে পেলে। সে যতই শোনে ততই ঘামে। বাকিটা জীবন দেবীকে পিঠে ক’রে ব’য়ে বেড়াতে হবে ভাবতেই তার রাগ হ’তে থাকলো। নিঃশ্বাস ঘন হ’য়ে এলো। বুকের ওঠাপড়া দ্রুত হ’লো।

ইতিমধ্যে মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একটা লোক সবজান্তার মতো ব'লে উঠলো, 'ও রাজি না-হ'লে গোটা গাঁ-টাই মায়ের কোপে পড়বে।'

'হ'তে পারে, কিন্তু একবার পোটরাজ হ'লে সারা জীবনই তো ওকে পোটরাজ থেকে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, তো সে খারাপ কী? ভালোই তো।'

'তোমরা বলছো! ছেলে আমার হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ছে।'

'তো? পোটরাজ হ'লে স্কুল কি পালিয়ে যাবে?'

'তুমি তা বললে কী হবে, কিন্তু ওর কেমন লাগে, তা তো ভাবতে হবে।'

'বাঃ, কেবল ছেলের কথাই ভাবছিস, বাকি গাঁ-টার কী হবে?'

'দু'জনের কথাই ভাবতে হবে।'

হঠাৎ মোড়লের সঙ্গে যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে একজন একরোখা গোছের লোক কর্কশভাবে ব'লে উঠলো, 'ছাড়্ তো, ওকে পোটরাজের পোশাক পড়িয়ে পাঠাচ্ছিস কি না? হ্যাঁ, না, না? গাঁয়ের ধারে মিছিল নিয়ে যেতেই হবে!' এই ধমকানোর সুর শুনে আনন্দ রাগে কাঁপতে শুরু করলে। লাফিয়ে উঠে সে হাত মুঠি করলে। রাগে তার চোখ ঠেলে বেরুচ্ছে। দুরপত ঠিক সেই সময় জবাব দিলে, 'এ-র'ম কথায় মায়ের রাগ কি পড়বে?'

মোড়ল দুরপতকে বলে, 'কথা ঘোরাস না। কাজের কথা বল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বল হ্যাঁ কি না?' ভয় দেখিয়ে গ্রামমণ্ডলের লোকেরা ফিরে গেলো। দুরপত বোঝে না কী করবে। ঘরে গিয়ে কপাল চাপড়ে মেঝেতে পড়ে সে। দামা শূন্যদৃষ্টিতে বৌ-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর আনন্দ দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দুরপত ভাবে ছেলেটা দৌড়ে গেলো কেন? ভাবতে-ভাবতে উঠে সে দরজায় যায়। দ্যাখে সে মারী-আই-এর থানের দিকে হনহনিয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকে, 'আনন্দ, আনন্দ।'

কিন্তু আনন্দ দ্রুত চ'লে যায়।

সেদিন অনেক রাত্রে সে বাড়ি ফিরে আসে। তাকে দেখে মনে হয় কোনো একটা ঘোরের মধ্যে আছে। রাত্রি যায়। সকাল আসে। সূর্য উঠলে সে চুপচাপ কাছের নদীতে চান করতে যায়। চান সেরে ধীরে-ধীরে বাড়ি ফিরে বাবার পাশে এসে বসে। বাড়িতে তখনও যারা আছে তাদের কথা শোনে সে। মন দিয়ে শোনে।

'শুনেছো! মা নিজের গাঁয়ের ধারে গিয়ে ব'সে আছেন।'

'হা ভগবান! গেলেন কী ক'রে?'

'বলিস কী রে, গেলেন কী ক'রে'! দেবতা তো। আজ এখানে, কাল ওখানে। বিশ্বসংসার ওনারই হাতে।'

‘ঠিক কথা! দেবীর লীলা!’

‘পেত্যয় যায় না।’

‘যা বলিস বল্। দেখে মনে হ’লো মা খুশিতে ব’সে। নতুন একটা সবুজ শাড়ি পরেছেন। গলায় অনেকগুলো সবুজ বালা দিয়ে তৈরি একটা নতুন হার। রুপোর চক্ষু সামনে চেয়ে আছে।’

‘তা-ই কী খালি! সারা গাঁ সেখেনে ভেঙে পড়েছে।’

দুরপত মাঝে এসে পড়ে, ‘সত্যি? সত্যি নাকি?’ তার এখনও সন্দেহ যায়নি। ‘সত্যি তো বটেই। মা নিজেই গাঁয়ের ধারে চলে গেছেন। বসার জায়গাটাও নিজে বেছেছেন। গাঁয়ের লোকের বিশ্বেস দেবীর চক্কর এবার কেটে যাবে।’

‘ঠিক। এতেই বোঝা যায় দামাকে দেবী কী চোখে দ্যাখেন। পোটরাজ বটে!’

‘বলছো তাই?’ দুরপতের আর খুশি ধরে না, ‘লোকে বলছে বটে দামার ভক্তির জোরেই মা গাঁয়ের ধারে গেছেন।’

‘লোকে বলছে দামা বড়ো পুণ্যবান।’

দামা, যে এতক্ষণ মরার মতো শূন্যচোখে শুয়েছিলো, শুনতে পেলো। দেহে যেন সে বল ফিরে পেলো। উঠে ব’সে জল চাইলো সে। খুব তেষ্টা পেয়েছে এইভাবে জল খেলো। তারপর একটু গরম ভাতের পায়েস খেলো। বেশ ভালো বোধ করতে লাগলো সে।

তাকে উঠে বসতে দেখে দুরপত একটু ঠাণ্ডা হ’লো। তার স্বামী হঠাৎ খাড়া হ’য়ে উঠেছে। এবার বেশ লাগছে তার। আকাশের দিকে স্পষ্টতই ভক্তি-ভরা চোখে তাকিয়ে সে হাত জোড় করলে।

‘হ’তে পারে, কিন্তু সকাল-সাঝ দেবীর ছায়ার বাস।’

‘সে-কথা ঠিক। আর দেবীর চক্কর যখন শুরু হয়েছে কে তাঁর কোপে পড়ে ঠিক কী!’

‘সে তো বটেই। সবাই থালায় নারকোল আর নিভোদ নিয়ে গাঁয়ের ধারে চলেছে। যে-কোনো জায়গা থেকে পুজোর আওয়াজ শুনতে পাবে।’

‘সবাই খুশি।’

ইতিমধ্যে মিছিল দামা পোটরাজের বাড়ির সামনে পৌঁছোয়। ঢাক বাজছে, ঘণ্টা বাজছে, গান হচ্ছে। দেবীর পূজা সেরে মিছিল ফিরছে। ভক্তেরা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, ‘মারী-আই কি জয়!’

উল্লাসের চীৎকার শুনে দামার হাতে পায়ে বল ফিরে আসে। তার মনে হয় ফের শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হ’লো। উঠে সে আস্তে-আস্তে দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজার কাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো মিছিলটা এখন তার বাড়ির সামনে। নারী-পুরুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় উল্লাসধ্বনি : ‘মারী-আই কি জয়! দামা পোটরাজ কি জয়!’

সেই চীৎকারে দামার মুখ আলো হ'য়ে যায়। তারপর মিছিল থেকে একজন এগিয়ে এসে তার গলায় হলুদ ফুলের মালা পরিয়ে দেয়, আর আবার সকলে তার নামে জয়ধ্বনি দেয় — 'দামা পোটরাজ কি জয়!'

আনন্দ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। অন্যমনস্কভাবে সে মিছিলটাকে লক্ষ করে। তার মুখ শক্ত হ'য়ে যায়। মিছিল গাঁয়ের দিকে এগোয়। দামা ঘরে ঢুকে আসে। দুরপত বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে! আনন্দ মায়ের কাছে এসে ফিশফিশ ক'রে বলে, 'মা, মারী-আই-কে আমি গাঁয়ের ধারে রেখে এসেছি।'

চমকে ওঠে দুরপত, গভীর আতঙ্কে জিগেশ করে : 'সত্যি? সত্যি করেছিস নাকি, বাবা?'

'হ্যাঁ, মা। মিছিলকে গাঁয়ের ধারে নিতেই হবে, তাই না?'

আনন্দের কথা শুনে দুরপতের মাথা নেমে আসে। পা কাঁপে। ছেলেকে হঠাৎ কাছে টেনে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, 'আনন্দ, ভুলিস না। কাউকে কখনো বলবি না, আমার মাথার দিব্যি। কাউকে না।' এই ব'লে তাকে আবার জড়িয়ে ধরে।

এবারে হাসে আনন্দ।

অনুবাদ : সুনন্দন চক্রবর্তী

শঙ্কররাও খারাট: (১১ই জুলাই ১৯২১ - ৯ই এপ্রিল ২০০১) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রে। সম্পূর্ণ নাম শঙ্কররাও রামচন্দ্র খারাট। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ড: বি. আর. আম্বেদকারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি মারাঠওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লেখায় মূলত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। জীবদ্দশায় খারাট ছয়টি উপন্যাস, আটটি ছোটগল্পের সংগ্রহ, একটি আত্মজীবনী এবং বেশ কয়েকটি অ-কল্পকাহিনীমূলক বই লিখেছিলেন, যার সব কটিই দলিত সংগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা, 'তারাল অন্তরাল'— একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। তাঁর অ-কাল্পনিক ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে মহারাষ্ট্রতিল মহারাঞ্চ ইতিহাস (মহারাষ্ট্রে মাহারদের ইতিহাস) অন্যতম।

তার সঙ্গে

পাবলো নেরুদা

সময়টা খুব সুবিধের না। আমার জন্যে অপেক্ষা করো।
দুজনে মিলে খুব সম্‌ঝে একে পার করতে হবে।
তুমি তোমার ঐ ছোট্ট দুটি হাত আমার হাতে রাখো
কষ্টেসৃষ্টেও উঠে দাঁড়াবো
ব্যাপারটা বুঝবো, আহ্লাদ করবো।

আমার আবার সেরকম এক জুড়ি
যার স্থানে-অস্থানে বেঁচেবর্তে এসেছে
পাথরে-ফাটলেও যাদের বাসা বানাতে আটকায় নি।

সময়টা মোটেই সুবিধের না। রোসো, আমার জন্যে দাড়াও,
কাঁকে ঝুড়ি নাও, শাবল নাও
জুতো পরো, কাপড়চোপড় সঙ্গে নিয়ে নাও, যা পারো।

এখন আমাদের একে অপরকে লাগবে
শুধু কারনেশন ফুলের জন্যে না
মধু তালাসের জন্যেও না
আমাদের দুজনের হাতগুলোই লাগবে
ধুয়ে মুছে আগুন বানাবার জন্যে।
এই যে সুবিধের-নয়-সময় মাথা যতোই উঁচু করুক
আমরা আমাদের চার হাত চার চোখে একে যুঝবোই।

অনুবাদ — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাবলো নেরুদা : (১২ই জুলাই ১৯০৪ – ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) ছিলেন চিলির বিখ্যাত কবি, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ, তাঁর প্রকৃত নাম নেফতালি রিকার্দো রেয়েস বাসোয়ালতো। তিনি তাঁর ছদ্মনাম পাবলো নেরুদা নামে সমাধিক পরিচিত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর কবিতা রচনার সূত্রপাত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ Twenty love poems and a Song of Despair ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। প্রতিবাদী কবিতা রচনার পাশাপাশি লিখেছেন পরাবাস্তববাদী কবিতা, রাজনৈতিক ইস্তাহার। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার পান। ১৯৭১ এ তাঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 'পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা' থেকে নেওয়া।